Bangladesh Journal of Political Economy

© 2012 Bangladesh Journal of Political Economy
Vol. 28, No. 2, December 2012, pp. 023-033
Bangladesh Economic Association
(ISSN 2227-3182)

২০২১ সালে বাংলাদেশের পুঁজিবাজার (২০১২ থেকে দেখা)

ওয়ালি-উল-মারূফ মতিন*

সম্মানিত সুধী, আজকের ও আগামীর অর্থনীতিবিদগণ, সবার জন্য শান্তি কামনা।

পুঁজিবাজারে সূচককে প্রায়শই বলা হয় উন্নয়নের সূচক। যারা বিশ্বাস করেন বেসরকারী খাতই হচ্ছে উন্নয়নের চাবিকাঠি, তাঁরা পুঁজিবাজারকে অবশ্যই গুরুত্ব দেবেন। আর সমাজতান্ত্রিক দর্শনে বিশ্বাসীদের জন্য পুঁজিবাজার হয়তো একটি জুয়ার আড্ডা। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতিকে ধন্যবাদ এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এই সময়ের জাতীয়ভাবে বিতর্কিত বিষয়টি সম্পর্কে আমাকে বলার সুযোগ দিয়েছেন।

তীর সামনে ছুঁড়তে হলে আগে পেছন দিকে টানতে হয়। ২০২১ সালের পুঁজিবাজার নিয়ে বলতে গেলে আমাকে ইদানিংকার প্রেক্ষাপটে সম্প্রতি বিগত বছরগুলির কথা মনে করতে হবে কেননা এই সময়ের পুঁজিবাজার নিয়ে কোন কথা বললে বা চিন্তা করলেই আমাদের চোখের সামনে শুধুমাত্র ভেসে উঠতে পারে সূচকের ক্রমাগত পতন, মতিঝিলে জ্বালাও, পোড়াও, ভাংচুর, বিনিয়োগকারীদের হতাশা, মিছিল ইত্যাদি। পত্রিকা খুললেই চোখে পড়ছে, এস ই সি'র তথাকথিত ব্যর্থতা ও সূচক পতন ঠেকানোর জন্য বিভিন্ন তদন্ত কমিটি গঠন ও প্রনোদনা প্যাকেজ নিয়ে আলোচনা। ২০২১ সালে এমন একটি প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে ২০২১ সালের পুঁজিবাজার নিয়ে আমার আশা, স্বপ্ন ও প্রত্যাশার কথাগুলি হয়তো আপনাদের কাছে কেবল প্রলাপ অথবা উচ্চাভিলাষী মনে হতে পারে। কিন্তু আমি বলব যে ব্যক্তি হিসেবে আমার, আপনার বয়স বেঁচে থাকলে বাড়বে বার্ধক্য আর জরার দিকে। কিন্তু জাতির ও দেশের, তথা গণতন্ত্র ও অর্থনীতির বয়স বাড়বে পরিপক্কতার দিকে, দৃঢ়তার দিকে।

শুরুতে এ কথাও বলতে হবে যে আমি দেশের ২০২১ এর পুঁজিবাজারের যে ভাষাচিত্র এখানে আঁকব সেখানে "যদি" এবং "কিন্তু" শব্দদ্বয়ের আধিক্য দেখা দেবে। এগুলি আমার মুদ্রাদোষ নয়। আমরা যে স্বপ্ন দেখি সে গুলো ড্রয়িং বোর্ডে পরিকল্পনার ছক পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া সহজ। বিপত্তি বাধে তার বাস্তবায়ন নিয়ে। তখন আসে এই "যদি" এবং "কিন্তু"র প্রশ্ন। আমরা মানি পুঁজিবাজার আপন গতিতে চলবে, বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু একে নিয়ন্ত্রণ করাও দরকার। "নিয়ন্ত্রণ" শব্দটির চেয়ে আমি "লালন পালন" শব্দটি ব্যবহারে বেশী পক্ষপাতী। লালন পালনের সব শর্ত যদি আমরা সুচারুভাবে মেনে চলি তবে আমাদের

* বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সদস্য ও সম্পদ ব্যবস্থাপক (অ্যালায়েন্স ক্যাপিটাল এ্যাসেট ম্যানেজমেন্টের চেয়ারম্যান)

পুঁজিবাজার ২০২১ সালের মধ্যেই একটা আধুনিক অর্থনীতির চালিকা শক্তির কেন্দ্র হিসেবে দাঁড়িয়ে যাবে। তখন আর এটা বলার লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না যে, পুঁজিবাজারের সংগে প্রকৃত অর্থনীতির চাকার যোগ সূত্র নেই কিংবা পুঁজিবাজার জুয়াড়ীদের আড্ডা। যে পুঁজিবাজারের সংগে প্রকৃত অর্থনীতির যোগ নেই, সে পুঁজিবাজার আমরা চাই না; যে পুঁজিবাজার জুয়ার আখড়া, তাকে আমরা ধ্বংস করব।

ভূমিকায় আর একটা কথা। পুঁজিবাজরের লাগামহীন গতি এবং অতিমাত্রায় উচ্চাকাঙ্খা ভয়ঙ্কর বৈষম্য সৃষ্টি করতে পারে। যে সমস্ত জাতি আন্দোলন করতে সহজে রাস্তায় নামে না তাদের মধ্যে ইংরেজ ও আমেরিকানরাও এখন ওয়াল স্ট্রিট বা লন্ডন সিটি দখলের মত কর্মসূচী নিয়ে সাড়া জাগিয়েছে। আমার এই বক্তব্যে আমি দৃঢ়তার সাথে সবাইকে যা মনে করিয়ে দিতে চাই তা হলো, বাংলাদেশের পুঁজিবাজারে ইউরোপ ও আমেরিকার মত ভয়াবহ ত্রুটিগুলো নেই। অপরিপক্ক হওয়ার এটি একটি সুবিধা। উত্তরণের পথে আমাদের অর্থনীতির ও বাজারের নীতি নির্ধারকরা তাই সঠিক দর্শনের পথ বেছে নেওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন। "উন্নত" বাজারগুলোকে অন্ধের মত দ্রুত অনুসরণ করলে আমাদেরও গোলক ধাঁধায় পড়ার সম্ভাবনা আছে। আমাদের এগুতে হবে আমাদের মত করে। বিশ্বায়নের সময় "বিশ্ব" নামের গ্রামে "বাংলাদেশ" নামে এক গৃহ বানাতে হবে। একটি অভূতপূর্ব আদর্শ গ্রাম।

আমার আলোচনায় তিনটি ভাগ থাকছে। (১) মধ্য আয়ের দেশ হিসেবে ২০২১ সালে বাংলাদেশের পুঁজিবাজারের আকার আয়তন কত বড় হতে পারে। (২) আকার আয়তন ও বিনিয়োগকারীর ঝুঁকির পরিপ্রেক্ষিতে বাজারে কী কী পণ্য থাকা যুক্তি সংগত এবং (৩) সুষ্ঠ, সুন্দর ও অর্থনীতির সংগে এই বর্ধনশীল পুঁজিবাজারকে লালন পালনের জন্য কী কী আইনগত অবকাঠামো ও পদক্ষেপ নেয়া দরকার।

২০২১ সালের পুঁজিবাজারের আনুমানিক আয়তন ঃ

২০১২ সালের এপ্রিলের শেষে আমাদের পুঁজিবাজারের আয়তন আগে দেখি। পুঁজিবাজারের আকার আয়তন মাপার জন্য স্বাভাবিক ভাবে আমি ব্যবহার করব:-

(ক) বাজার মূলধন; (খ) স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভূক্ত পণ্য, অর্থাৎ স্টক ডিবেঞ্চার, বন্ড ইত্যাদির সংখ্যা; (গ) পরিমাণ ও লেনদেনের পরিমাণের তারল্য।

ডি এস ই সূচক নিয়ে আমি আলোচনা করব না। কারণ ডি এস ই ২০২১ সালের মধ্যে নতুন সূচক নিয়ে আসবে। এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে বর্তমানের ত্রুটিপূর্ণ সূচক তখন পর্যন্ত চলবে না। তাই সূচকের ২০১২ আর ২০২১ এর তুলনা হবে অবান্তর।

১. বাজার মূলধন ও সিকিউরিটিজের সংখ্যা

পুঁজিবাজারের মূলধন আমাদের প্রধান বিবেচ্য বিষয়। বর্তমানে – জুন ২০১২ শেষে – আমাদের বাজার মূলধন ২৩৭ হাজার কোটি টাকা। ২০২১ সালের প্রক্ষেপন করতে আমরা দুটো পদ্ধতি নিতে পারি। (ক) বাজার যে ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে সেই অনুপাতে এগিয়ে যাওয়া যায় এবং (খ) মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) সংগে অনুপাত হিসাব করা যায়।

গত ১০ বছরে গড়ে দেশের পুঁজিবাজারের আকার বেড়েছে ১৩% হারে। ২০১১ সালের অস্বাভাবিক ব্যবসায় বাদ দিলে খুব কম করে হলেও দেশের পুঁজিবাজার যে এই হারে বাড়ছে এ কথা স্পষ্ট বলা যায়। এখন এই ১৩% করে প্রতি বছর বৃদ্ধি পেলে ২০২১ সালে আমাদের বাজার মূলধন হবে ৮৮৮

হাজার কোটি টাকা। ডিসেম্বর ২০১১ শেষে, বাজার মূলধন ছিল ২৬৫ হাজার কোটি টাকা। অর্থাৎ, সোজা করে বললে ২০২১ সালে বর্তমানের চাইতে মূলধন দাঁড়াবে ৩.৩৪ গুণ ।

এবার অন্যভাবে দেখা যাক। বর্তমানে বাজার মূলধন মোট জিডিপির ৪০% এর সমান। মধ্যম আয়ের অন্য দুএকটি দেশের সাথে যদি তুলনা করি; ধরি চীন বা থাইল্যান্ডের মত যদি আমাদের বাজার মূলধন-জিডিপি অনুপাত হয় ৮০%,তবে বাজার মূলধন দাঁড়াবে ১,১৭৬ হাজার কোটি টাকা অর্থাৎ বর্তমানের ৪.৭২ গুণ। অথবা মালয়েশিয়ার মত যদি হয় ১৭০%, সে ক্ষেত্রে বাজার মূলধন দাঁড়ায় ২,৪৯৯ হাজার কোটি টাকা। অর্থাৎ, বর্তমানের চেয়ে ৯.৪ গুণ।

২০০৭ সালে তালিকাভূক্ত সিকিউরিটিজ এর সংখ্যা ছিল ৩৫০টি, ২০০৮ সালে ছিল ৪৭২টি। ২০০৯ এ এটি বাড়ে মাত্র ০.৭৩%। ২০১২ তে ৭.২৩% বেড়ে সর্বমোট বন্ড-স্টকের সংখ্যা দাঁড়ায় ৫০১। এই হারে ২০২১ সনে দাঁড়াবে ১,৩২৭ টি।

সিকিউরিটিজের সংখ্যা বাড়ার অর্থ বিনিয়োগকারীরা আরও বেশী ঝুঁকি এড়াতে তাদের পত্রকোষে (পোর্টফোলিও) বৈচিত্র আনতে পারবেন। কিন্তু সেটিই মূল কথা নয়। মুদ্রার অপর পিঠটা আরও বেশী গুরুত্ব বহন করে। অর্থাৎ, আরও বেশী বেশী উদ্যোক্তা দেশে শিল্প ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য পুঁজিবাজারে আসবেন। পুঁজিবাজার দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠান, কলকারখানা ও ব্যাংক বীমা সহ সকল খাতে পুঁজি সরবরাহ করবে। পুঁজিবাজারের মাধ্যমেই দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকানা জনগণের কাছে পৌঁছাবে এবং খরচও কম হবে। পাবলিক সেক্টর বলতে সরকারী খাত বোঝাবে না। বোঝাবে জনগণের মালিকানায় থাকা অর্থনীতি।

আমাদের মধ্যে যারা এখনো সমাজতান্ত্রিক সম-অধিকারে বিশ্বাসী, তাঁদের জন্য বলি পুঁজিবাজার একটি দেশের অর্থনীতিতে আপামর না হলেও বৃহত্তর জনসাধারণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে। কোন একটি কোম্পানির পরিচালনা এবং মুনাফা বা ক্ষতিতে বিনিয়োগকারীদের অংশগ্রহণ তাদের শেয়ারের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। আর সার্বক্ষনিক সরকারী নজরদারী, তত্ত্বাবধান, তদারকি স্বচ্ছতা ও অধিকার নিশ্চিত করে।

কার্যকর পুঁজিবাজার দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়নের উপযুক্ত উৎস। পুঁজিবাজার ব্যাংকের উপর চাপ কমিয়ে, দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগে আকৃষ্ট করে। আবার ব্যাংক নিজেও পুঁজিবাজার থেকে তাদের পুঁজি সংগ্রহ করে। অধিকাংশ তালিকাভূক্ত ব্যাংক তাদের ৪০০ কোটি টাকার একটি বড় অংশ পুঁজিবাজার থেকে সংগ্রহ করছে। প্রতিযোগিতামূলক মূল্যায়ন পদ্ধতির মাধ্যমে মূলধনের যথার্থ বরাদ্দকরণ পুঁজিবাজারে হওয়া সম্ভব যা একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথকে সুগম করার জন্য বর্তমান বিশ্বে অপরিহার্য।

পণ্যের বৈচিত্র

স্টক-এক্সচেঞ্জের তালিকাভূক্ত পণ্যের সংখ্যা, বৈচিত্র ও বিভিন্নতা একটি দেশের পুঁজিবাজার ও অর্থনৈতিক অবকাঠামোগত সম্পূর্ণতা অনেকটাই প্রকাশ করে। আকার আয়তন ও সংখ্যার কথা আমাদের আলোচনা করা দরকার। পাশাপাশি পণ্যেও বৈচিত্র আনা অত্যন্ত জরুরী। দুঃখজনক হলেও সত্য, একজন ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারী বর্তমান ২০১২ এর বাজারে কেবল ইক্যুইটি শেয়ার ও কয়েকটি বন্ড পাচ্ছে। বন্ডগুলোও আবার চরম তারল্যের সংকটে ভুগছে। যারা বাজার থেকে পুঁজি উত্তোলন করেন, শুধুমাত্র ইক্যুইটিই তাঁদের মুখ্য মাধ্যম। এ বাজারে না আছে মিউচুয়াল ফান্ডগুলোর বৈচিত্র, না আছে

বিকল্প বিনিয়োগ (Alternative Investment) যেমন, কমোডিটি, প্রাইভেট ইক্যুইটি, হেজ ফান্ড (Hedge Fund) অথবা ডেরিভেটিভস (Derivatives) এর ব্যবস্থা। পুঁজিবাজার ভীষণভাবে বাধাগ্রস্থ হচ্ছে যথাযথ অবকাঠামো ও সঠিক নির্দেশনার অভাবে। ২০২১ সালে এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে আশা করছি। কী কী পণ্য ২০২১ সালের মধ্যে আসতে পারে তার একটি চিত্র আপনাদের দেয়ার চেষ্টা করি।

২. মিউচুয়াল ফান্ড ও ই-টি-এফ

অপেক্ষাকৃত নিরাপদ বিনিয়োগের জন্য সম্মিলিত বিনিয়োগ বা মিউচুয়াল ফান্ড সারাবিশ্বে একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় মাধ্যম। অন্যান্য দেশে মিউচুয়াল ফান্ড বলতে গেলে যেখানে মূলত: বে-মেয়াদী ফান্ডগুলোকেই বোঝানো হয়, আমাদের দেশে চিত্র অনেকটাই ভিন্ন। মিউচুয়াল ফান্ড কোন ইক্যুইটি শেয়ার বা স্টক নয় এটি একটি নিরাপদ বিনিয়োগের মাধ্যম যা বিনিয়োগকারীদের বিশেষ করে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারী যারা যথার্থ অথবা প্রচুর পরিমাণ অর্থের অভাবে diversificationএর সুবিধা পাচ্ছেন না তাদের জন্য। দশ হাজার টাকা দিয়ে ১০টি শেয়ার কিনে নিরাপদ পত্রকোষ (পোর্টফোলিও) সাজাতে পারবেন না। অথচ ১০ হাজার টাকার মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিট কিনলে শতকোটি টাকার ফান্ডের যে বৈচিত্র, তা উপভোগ করবেন।

বর্তমান বিশ্বে মিউচুয়াল ফান্ডগুলোর অবস্থা জানতে একটু পরিসংখ্যান দেখি।

বিশ্বের মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ২৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার। কেবলমাত্র আমেরিকান বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর নীট সম্পদের পরিমাণ ১১.৮ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পুরো বিশ্বের মোট মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগের ৪৮%। এছাড়াও Africa ও Asia Pacific এলাকার বিনিয়োগের পরিমাণ ১৩% ও ইউরোপের বিনিয়োগ প্রায় ৩২%। অথচ আমাদের দেশে মিউচুয়াল ফান্ড এখনও ২% ও হয়নি।

মিউচুয়াল ফান্ড আজকাল ইনডেক্সের সঙ্গে সংযুক্ত হয়, এর সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো স্বচ্ছতা। স্টকের সাথে সাথে এর মূল্যও বাড়ে এবং কমে। আর ১টি unit কেনা মানে পুরো index এর ব্যাপ্তিতে পত্রকোষ (portfolio)এর ১টা অংশ কেনা। যে কোন ১টি শেয়ার কেনাবেচার চাইতে মিউচুয়াল ফান্ডে একটি একক কিনলে লাভ অনেক বেশী। ঝুঁকি অনেক কম। আর মিউচুয়াল ফান্ডটি ই-টি-এফ (এক্সচেঞ্জ ট্রেডেড ফান্ড) এ রূপান্তরিত হলে স্বচ্ছতার কারণে বেশীরভাগ বিনিয়োগকারী এটি পছন্দ না করে পারবেন না। সাধারণ বিনিয়োগকারীরা ইক্যুইটি-বন্ডের পাশাপাশি সমান বা বেশী গুরুত্ব দিয়ে যেগুলো বেচাকেনা করবেন সেগুলো হলোঃ ই-টি-এফ।

সম্মিলিত বিনিয়োগ স্কীমের সর্বাধুনিক রূপ হল ই-টি-এফ। সম্মিলিত বিনিয়োগ হলেও ই-টি-এফ সচরাচর অতালিকাভূক্ত বে-মেয়াদী মিউচুয়াল ফান্ড থেকেও বেশী সুবিধাজনক, বাংলাদেশের বে-মেয়াদী ফান্ডগুলোর স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্তির সুযোগ এই মূহুর্তে নেই। সপ্তাহে একদিন মিউচুয়াল ফান্ড তাদের এন-এ-ভি (নেট অ্যাসেট ভ্যালু) প্রকাশ করে। ই-টি-এফ স্টক এক্সচেঞ্জে বেচাকেনা করা যায় আর এন-এ-ভি হিসেব না করেই এগুলো ক্রমাগত সূচককে অনুসরণ করে। সপ্তাহে একবার নয়, প্রতি মূহুর্তের মূল্যই সবার কাছে স্পষ্ট। সাধারণ মিউচুয়াল ফান্ড থেকে সারা বিশ্বে এগুলো অনেক জনপ্রিয়। এতে ফান্ড ম্যানেজারদের ওপর নির্ভরশীলতা কমে। আমাদের স্টক এক্সচেঞ্জ দুটোর কারিগরি উন্নয়নের পাশাপাশি কিছু সামঞ্জস্যপূর্ণ আইন তৈরী করে নিলেই ই-টি-এফ বাজারে আসতে পারবে।

ওয়ালি-উল-মারুফ মতিন : ২০২১ সালে বাংলাদেশের পুঁজিবাজার (২০১২ থেকে দেখা) ২৭

বিনিয়োগকারীদের জন্য তো বটেই, প্রতিদিনের ট্রেডারদের কাছেও তখন ই-টি-এফ অত্যন্ত আকর্ষণীয় এক সম্মিলিত বিনিয়োগের মাধ্যম হয়ে দাঁড়াবে।

ঋণ মূলধন (**Debt Instruments)**

আগেই বলেছি, একটি সংগঠিত পুঁজিবাজারের বৈশিষ্ট্য হল এর instrument গুলোতে বৈচিত্র্য ও ব্যাপকতা। ২০১২ সালে আমাদের পুঁজিবাজারে instrument গুলোর বিভিন্নতা নেই। ২০২১ সালের মধ্যে এই অবস্থা থেকে বের হয়ে আসতে হবে। বাজারের গভীরতা বাড়াতে এবং পর্যাপ্ত তারল্যের যোগান দিতে equity গুলোর পাশাপাশি ঋণ অর্থায়নের instrument অর্থাৎ বন্ডের কোন বিকল্প নেই। বিভিন্ন প্রকারের bond এবং debenture এই বৈচিত্র আনায় মূল ভূমিকা নিতে পারে।

বিভিন্ন প্রকার bond এর মধ্যে বাংলাদেশে Government Treasury Bond এবং মাত্র কয়েকটি Corporate Bondই এখন পরিচিত। Bond গুলোর মাধ্যমে উদ্যোক্তাগণ এবং সরকার স্বয়ং পুঁজিবাজার থেকে টাকা তুলতে পারেন। অর্থাৎ দ্বৈত উদ্দেশ্য সামনে রেখে bondকে পরিচিত করাতে হবে। যে কোন বুদ্ধিমান বিনিয়োগকারী ঝুঁকিপূর্ণ শেয়ারের পাশাপাশি ঝুঁকিহীন বন্ড কিনতে চাইবেন। বেশী লাভের আশায় বেশী ঝুঁকি নিতে হয়। আর কম লাভে সন্তুষ্ট থাকলে ঝুঁকির প্রয়োজনীয়তাও কমে। প্রত্যেক বিনিয়োগকারীর ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা আলাদা, লাভ করার স্পৃহাও আলাদা। সেই ক্ষমতা ও স্পৃহা মাফিক শেয়ার আর বন্ডের একটা সুমিশ্রন দরকার। আমাদের বাজারে এই মিশ্রনের বড়ই অভাব। তবে আমাদের SEC যে সমস্ত পদক্ষেপ নিয়েছেন, ২০২১ সালের মধ্যে আমরা একটা কার্যকর বন্ড বাজার পাব বলে আশা করতে পারি।

DSEতে listed Government Treasury Bond আছে ২২১টি। কিন্তু এগুলোকে বাজারে লেনদেনযোগ্য করলে আরও ভাল ফল পাওয়া যেতে পারে। Corporate Bond আছে মাত্র ৩টি এবং Debenture আছে মাত্র ৮টি। কী ভাবে লেনদেনযোগ্য করা যায়? আমাদের সুদের হার অত্যন্ত বেশী। অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য সুদের হার কমিয়ে এটাকে টেকসই অবস্থায় নিয়ে আসতে হবে। সুদের হারকে শেয়ার বাজার নিয়ন্ত্রণ করে না। আমরা কেবল আশা করতে পারি কেইনসের তত্ত্ব এখানে কাজ করবে ও সুদহার কমে আসবে।

যেহেতু সুদের হারের সাথে বন্ডের দাম ঋণাত্বকভাবে সম্পর্কিত তাই সুদের হারের উর্দ্ধগতি বিদ্যমান ঋণপত্রের বাজারকে প্রভাবিত করে এর মূল্য কমাতে পারে। সুদের হার ইসলামেও শূন্য করতে বলেছে। সাধারণ সুদের হার কমলে পুঁজিবাজারে ঋণাত্মক প্রভাব পড়বে।

২০০৯ সালের হিসাব অনুযায়ী বিশ্বব্যাপি bond marketএ মোট ঋণ ছিল ৪২.২ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার। এশিয়ান দেশগুলো short term foreign borrowing এর উপর নির্ভরশীলতা কমাতে সহজেই domestic bond marketকে ব্যবহার করতে পারে। আমাদের দেশও এর ব্যতিক্রম নয়।

২০০৮ সালের হিসেব মতে, চায়নাতে যেখানে bond গুলোর মোট ঋণ হলো মোট দেশজ উৎপাদনের ৫০ শতাংশের ওপরে, কোরিয়া এবং মালয়েশিয়ার ক্ষেত্রে এই অনুপাত যথাক্রমে ১০০% ও ৮৫% এর ওপরে। থাইল্যান্ড এ এই অনুপাত ৫৬.৬%, ভিয়েতনামে ১৬.৭%, ভারতে ৪০%। বাংলাদেশের বর্তমান ঋণ বাজারের আয়তন প্রায় এক বিলিয়ন মার্কিন ডলার এর মত যেখানে GDP ১১১.৫৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। কিন্তু এর কার্যকর ভূমিকা নগন্য পর্যায়ের। বাংলাদেশের ঋণপত্র গুলোতে

বিদেশি বিনিয়োগের জন্য সুযোগ যথাযথ নয়। ঋণ বাজার-এর বিনির্মাণ এজন্য অবশ্যই প্রয়োজন। বাংলাদেশ ব্যাংক-এর নিয়ম অনুযায়ী বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণপত্রে বিনিয়োগেও যথেষ্ট কঠোরতা অবলম্বন করা হয়। এই কঠোরতার প্রয়োজন আছে। আমরা ২০২১ সালের মধ্যে পুঁজিবাজারের অংশ হিসেবে বাংলাদেশে একটি সুপরিচিত, সুগঠিত ও সুশৃঙ্খল bond market পাবো।

৩. কমোডিটি এক্সচেঞ্জ

কমোডিটি ট্রেড পুঁজিবাজারের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কিন্তু দেশে বিপুল আকারের এক কমোডিটি বাজার থাকলেও কোন কমোডিটি এক্সচেঞ্জ নেই। ২০২১ সালের মধ্যে দেশে কমোডিটি এক্সচেঞ্জ আসবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। আমি ধরে নিচ্ছি, পুঁজিবাজার আর স্টক এক্সচেঞ্জের পার্থক্য সবাই জানেন।

পণ্য বিনিময় থেকে শুরু হওয়া ব্যবসায় আজ পরিবর্তিত হয়েছে অত্যাধুনিক বাণিজ্য পদ্ধতিতে। আর সকল ব্যবসায়ের অন্তঃস্থল হল একটি বাজার। বাজার অর্থনীতিতে 'বাজার' শব্দটির অর্থ ব্যাপক। সঞ্চয় আর বিনিয়োগের প্রশ্নে সে বাজার বলতে চাল-ডাল কিংবা সোন-রূপা অথবা শেয়ার বাজার প্রায়ই একাকার হয়ে যায়। ভারসাম্যহীন বাজারে দেখা যাবে পণ্যের মুল্যের অস্বাভাবিক উত্থান পতন। আর ভারসাম্যপূর্ণ বাজারে থাকবে একটা স্বাভাবিক উন্নয়নের ছন্দ।

কৃষি বাজারে উৎপাদনকারী যথার্থ দাম পাচ্ছে না, মধ্যস্বত্বভোগীদের অস্বাভাবিক উচ্চ হারে আয় কর্তন, আর শেষে ভোক্তার অনুযোগ যে দাম অত্যন্ত বেশী। এ সবই বর্তমান প্রেক্ষাপটের অংশ। সবকিছুর মূলে রয়েছে অসামঞ্জস্যপূর্ণ বাণিজ্যিক ব্যবসা, যথাযথ কর্তৃপক্ষের তদারকির অভাব ও যথেষ্ট উন্নত যোগাযোগের অভাব। ত্রুটিপূর্ণ এই অদৃশ্য বাজারকে দৃশ্যমান এবং কার্যকর করার একটি উপায় হল commodity exchange। মুক্তবাজার অর্থনীতি কিন্তু কখনোই লাগামহীনভাবে চলে সফল হতে পারে না। তাই বিশ্বের প্রায় সব দেশেই, উন্নত দেশেতো বটেই, উন্নয়নশীল দেশগুলোতেও commodity exchange আছে ও গড়ে উঠছে। দক্ষিণ এশিয়ার ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা ও নেপালে commodity exchange আছে। শ্রীলংকায় আরেকটি commodity exchange প্রতিষ্ঠা নিয়ে ভাবা হচ্ছে।

যে কোন বাজারের মতই Commodity exchange হচ্ছে ক্রেতা-বিক্রেতার একটা সম্মেলন কেন্দ্র। ক্রেতা-বিক্রেতার সম্মেলন কেন্দ্র মানে এই নয় যে বাজারের থলে হাতে ঘুরতে হবে। আধুনিক commodity exchange ক্রেতা বিক্রেতাদের দর দামের জন্য একটিমাত্র কমন কম্পিউটার সিস্টেম ব্যবহার করে যেখানে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সঠিক দামটি নির্ধারিত হয়। আপনি এই সিস্টেমে লগ ইন করলেন মানে আপনি বাজারে উপস্থিত। এই কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ব্যবহারের ফলে একটি মূল বাজারের সঙ্গে দেশের (এবং বিদেশের) সব জায়গা থেকেই উৎপাদনকারী, ব্যবসায়ী বা ভোক্তারা এই বাজারে অংশ নিতে পারছেন।

এখানে দুই ধরণের বাণিজ্য যথা cash বা স্পট এবং Futures চুক্তির মাধ্যমে সম্পন্ন করা যেতে পারে। Futures চুক্তি ব্যবসায় এর ধারণা আমাদের দেশে নতুন নয়। উত্তরবঙ্গের আম ও লিচুর বাগান কিংবা খাতুনগঞ্জের অসংখ্য পণ্য এ রকম ভবিষ্যৎ চুক্তির মাধ্যমে অনেকদিন আগে থেকেই বেচাকেনা হয়। Futures এর ধারণাও জটিল কিছু নয়। কোন পণ্যে মূল দাম, মান ও পরিমাণ এখনই ক্রেতা, বিক্রেতা ঠিক করবেন। কিন্তু এক ভবিষ্যৎ তারিখে সেটেলমেন্ট অর্থাৎ পণ্যের ফিজিকাল লেনদেন ঘটায়।

কেন কমোডিটি এক্সচেঞ্জের জন্য এই জোরদার আশা তার কারণ হিসেবে বলি কমোডিটি এক্সচেঞ্জের জন্য:

১. কৃষি পণ্যের ক্ষেত্রে কৃষকমূল্য ও ভোক্তামূল্যের ব্যবধান কমে আসে।

২. মুক্তবাজার অর্থনীতির ধারণাকে মাথায় রেখে একই কেন্দ্র ভিত্তিক বাণিজ্যক পণ্যের ন্যায্য মূল্য নির্ধারণে সহায়তা করে।

৩. মূল্য হ্রাস বৃদ্ধির আগাম সংকেত পাওয়া যায় আগাম মূল্য নির্ধারণের মাধ্যমে। যার পরিপ্রেক্ষিতে পণ্য সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

৪. আগাম চুক্তি সাধারণত ব্যাংকের কাছে গচ্ছিত রেখে প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান দেয়া হয়।

৫. তৃতীয় পক্ষের দ্বারা পরীক্ষিত ও নিয়ন্ত্রিত বিধায় পণ্যের মান সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়।

৬. তথ্য বলে, Financial Asset Class এবং Commodity Futures এর correlation negative। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিনিয়োগের উপাদান গুলোতে বৈচিত্র এনে ঝুঁকি কমাতে পারে এবং এই মার্কেটে বিনিয়োগ করে আগাম চুক্তির মাধ্যমে ভবিষ্যৎ দামের হেরফেরে নিহিত ক্ষতির ঝুঁকি কমাতে পারে।

৭. একটি আইনগত অবকাঠামোর মধ্যে বাণিজ্য হয় বলে তথ্যের আদান প্রদানের ব্যাপকতা সামগ্রিক বানিজ্য পদ্ধতিটিতেই স্বচ্ছতা আনে।

বিশ্বের প্রথম কৃষিপণ্যের কমোডিটি এক্সচেঞ্জটি গঠিত হয়েছিল Belgiumএ একাদশ শতকে। আর বিশ্বে প্রাচীনতম কমোডিটি এক্সচেঞ্জটি অবস্থিত Chicago শহরে, Chicago Board of Trade নামে পরিচিত যা ১৮৪৮ সালে গঠিত হয়।

২০০৯ সালে বাণিজ্যমন্ত্রী ঘোষণা দেন আগামী এক বছরের মধ্যে ১০ বছরের জন্য বাংলাদেশের প্রথম commodity exchange হবে যেখানে আলু এবং পাট এর বানিজ্য চলবে। তবে ২০২১ সালের আগেই আমরা নিশ্চই এর বাস্তবায়ন দেখতে পাবো। সম্প্রতি কমোডিটি এক্সচেঞ্জ নিয়ে আইনের খসড়া তৈরী করেছেন এস-ই-সি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গরা।

একটি সুগঠিত কমোডিটি এক্সচেঞ্জ, যা নিশ্চিত করবে বিভিন্ন দৈনন্দিন ও বিনিয়োগযোগ্য পণ্যের সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ বাণিজ্য, নিয়ে আসতে পারে এই সমস্যাগুলোর সমাধান, বোধ করি এটা রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী ইশতিহারগুলোকে সমৃদ্ধই করবে বৈকি।

গবেষণায় দেখা গেছে, বাংলাদেশে একটি commodity exchange গঠন করতে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তার প্রায় সিংহভাগই খরচ হবে তথ্য প্রযুক্তিগত প্রয়োজনে। যার সাথে দুটি শর্ত অবশ্যই জুড়ে দিতে হয়-

১. গুণগত মান এর দিক থেকে পণ্যের অবস্থা নির্ধারণ।

২. সুষ্ঠ, সুন্দর ও আবহাওয়া উপযোগী গুদামের ব্যবস্থা।

কমোডিটি এক্সচেঞ্জকে বলা হয় Ecosystem। কারণ সকল কমোডিটি এক্সচেঞ্জই পণ্যের গুণগত মান, গুদামজাতকরণ, পরিবহন ব্যবস্থা সব নিয়ে গঠিত। আর যখন এই Ecosystem প্রতিষ্ঠিত তখন তার

উপরে নিয়ন্ত্রণ, উন্নয়ন, আন্তর্জাতিক অন্যান্য বাজারের তাৎক্ষণিক যোগাযোগ সম্ভব হবে। আইন সম্মত ও প্রাতিষ্ঠানিক commodity exchange ছাড়া এগুলো সম্ভব নয়।

আবার ঝুঁকির কথায় ফিরে আসি। কমোডিটির ফিউচার ট্রেডিং এর মাধ্যমে ঝুঁকি কমানো বা Hedge করা সম্ভব। আমরা পুঁজিবাজারে প্রায়ই একটি শব্দ শুনে থাকি "Gambler" বা "জুয়াড়ী" এবং এই শব্দটির ব্যবহার সচরাচর ঋণাত্মক ভাবেই হয়ে থাকে। gamblerদের বৈশিষ্ট্য হলো তারা ঝুঁকি তৈরি করে। একটি Efficient Market পেতে হলে এই "gambler"দের জায়গায় অবশ্যই নিয়ে আসতে হবে "speculator"দেরকে, যার বাংলা শব্দটি তুচ্ছার্থে ব্যবহার হয় "ফটকাবাজ"। এরা কিন্তু ঝুঁকি তৈরি করেনা বরঞ্চ বাজারে যে ঝুঁকি বিদ্যমান আছে তা গ্রহণ করে। Speculatorদের কাজ হলো, যারা ঝুঁকি নিতে চায়না এবং সম্ভাব্য ঝুঁকির বিপরীতে নিশ্চয়তা বলয় সৃষ্টি করতে চায় অর্থাৎ "Hedgers", তাদের সেই না নিতে চাওয়া ঝুঁকিটাই গ্রহণ করা এবং তা থেকে সম্ভাব্য আয় তৈরি করা।

বাজারে ঝুঁকি তৈরি করা gamblerরাই অস্বাভাবিক উত্থান পতন তৈরি করে যা মোটেই কাম্য নয়, বরঞ্চ speculators যারা বাজারের স্বাভাবিক ও অপ্রতিরোধ্য ঝুঁকি গ্রহণ করে, hedgers যারা ঝুঁকি এড়িয়ে চলে, তাদেরকে সাহায্য করে, তারাই কাম্য বাজারের ঝুঁকিও আয়ের মধ্যে অভ্যন্তরীন ভারসাম্য রক্ষা করে বাজারকে একটি সামঞ্জস্যতা দিতে। মুক্তবাজার অর্থনীতিতে সকল পণ্যের বানিজ্যিক শর্তগুলো ঠিক করে চাহিদা এবং যোগান। এই চাহিদা ও যোগানের মধ্যে একে অপরের যে সম্পর্ক তার গাণিতিক উদ্বৃত্তকে কাজে লাগিয়ে Speculatorরা নীতিগত ব্যবসা করতে চায়, যেখানে gamblerরা কৃত্রিম চাহিদা বা যোগান তৈরি করে স্বাভাবিক মাত্রার উদ্বৃত্তকে অস্বাভাবিক করে তোলে যা বাজারকে ঝুঁকির মুখে ঠেলে দেয়।

Speculator-রা ভাগ্য বা Manipulation এর সাহায্য নেন না, তারা রীতিমত বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত এবং তার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে ভবিষ্যৎ অবস্থাকে অনুমান করার চেষ্টা করেন এবং তার ভিত্তিতেই একটি স্বচ্ছ বানিজ্য করে মুনাফা অর্জনের চেষ্টা করেন। অন্যদিকে Gamblerদের কাছে তথ্য উপাত্ত মূল্য মূল্যহীন, মূল্য রাখে না কোন সম্ভাবনার কথা, বরঞ্চ তারা অস্বাভাবিক সম্ভাবনার জন্ম দেয় যা ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবসা পদ্ধতিকে বাধাগ্রস্ত করে। Gambling একটি আসক্তি ও খেলার মত যা অনেক ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের জন্য সর্বনাশ ডেকে আনে যেখানে Speculator-রা বাজার বান্ধব সহযোগী entity যারা বাজারে ভারসাম্য আনে। Gamblerরা বাজার এবং তার ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত নয় তারা অস্বাভাবিক মুনাফার খোঁজে থাকে যেখানে ঝুঁকিও অস্বাভাবিক মাত্রার, অন্যদিকে Speculator-রা বাজারের ভবিষ্যৎ-এ একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ বাণিজ্য উপহার দেয় এবং একই সাথে ক্রমবর্ধমান তারল্য নিশ্চিত করে।

৪. ইসলামিক Capital Market

বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত এ ক্ষেত্রটি অনাবিস্কৃত। বাংলাদেশের জনসংখ্যার ৮৫% মুসলমান যেখানে দেশে ইসলামিক পুঁজিবাজার নেই শুনে বহির্বিশ্বের অনেকেই অবাক হন। আমি ব্যক্তিগতভাবে ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ। বলে রাখি ইসলামিক পুঁজিবাজার বলতে আমি কোন ধর্ম প্রচারে যাচ্ছি না। কিন্তু ইসলামিক পুঁজিবাজারের গুরুত্ব ও অর্থনীতিতে এর প্রভাব অত্যন্ত সুন্দর হতে পারে। ২০১১ সালের "অক্যুপাই ওয়াল স্ট্রীট" এর আন্দোলনের মাধ্যমে ইসলামিক পুঁজিবাজারের মূলত এর জনপ্রিয়তা ও যৌক্তিকতা নতুন করে খুঁজে পায় বাজার বিশেষজ্ঞরা। এই ধারণাটির উৎপত্তি প্রায় চার দশক আগে

ওয়ালি-উল-মারুফ মতিন : ২০২১ সালে বাংলাদেশের পুঁজিবাজার (২০১২ থেকে দেখা) ৩১

হলেও এখনো পর্যন্ত এর প্রসারের সুযোগ রয়েছে অনেক। এর প্রসার অমুসলিম দেশেও দেখার মত। মূলত বিগত ৫/৬ বছরে শরীয়া ভিত্তিক পণ্যের প্রচার ও প্রসার ঘটেছে ব্যাপকভাবে। কাছের দেশ মালয়েশিয়াই শরীয়াভিত্তিক অর্থনৈতিক পণ্যের প্রসারে উদাহরণ হিসেবে আছে আমাদের সামনে। সেই বিচারে ফ্রান্স হচ্ছে একটি ইমার্জিং দেশ। শরীয়াভিত্তিক পুঁজিবাজার প্রচলিত/গতানুগতিক বাজারের সাথেই চলতে পারে পাশাপাশি একই অবকাঠামোতে। আমার বিশ্বাস এবং বিশ্বাসের ভিত্তিও অনেকটাই মজবুত যে বিশ্বের অন্যতম মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এ দেশে শরীয়া ভিত্তিক fund বা যে কোন পণ্য সহজেই আকৃষ্ট করতে পারে অনেক বিনিয়োগকারীকে।

ইসলামিক পণ্যের বৈচিত্রের মধ্যে থাকতে পারে, ইক্যুইটি প্রোডাক্ট, REITS (রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট), Morabahah Bonds/ Notes, Sukuk Ijarah, Sukuk Mudarabah, Sukuk Musharakah, ইসলামিক ডেরিভেটিভ প্রোডাক্ট, (যেমন ঃ Forward Currency Option, Profit Rate SWAP etc.) ইত্যাদি।

১৯৮৮ সালে নোবেল বিজয়ী অমুসলিম ফরাসী অর্থনীতিবিদ মরিস আলেতার দূরদৃষ্টির মাধ্যমে অনুমান করেছিলেন বর্তমান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সঙ্কট-এর এবং হুশিয়ার করেছিলেন এর চরম পরিণাম সম্পর্কে। তাঁর মতে, এ অর্থনৈতিক সঙ্কট উত্তরণের সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা হলো, কার্যকরী মনিটরীং সিস্টেম প্রবর্তন, যা সত্যিকার ভাবেই ভবিষ্যতে এ সঙ্কট মোকাবিলায় সাহায্য করবে। তাঁর প্রস্তাবিত পদ্ধতির মূলে ছিল মূলত দুটি অংশ / উপাদান-

এক) সুদের হার শুন্য পর্যায়ে নিয়ে আসা এবং

দুই) কর হার ২% করা।

আশ্চর্যজনক হলেও সত্য, এ নিয়ম অনেকটাই ইসলামি অর্থনীতির মূল বিধান এর খুবই কাছাকাছি। আমরা সবাই অবগত যে, সুদকে ইসলামে হারাম করা হয়েছে (i=o) এবং মৌলিক চাহিদার অথবা নিসাব পরিমাণ সম্পদের উদ্বৃত্ত অংশের উপর বার্ষিক ২.৫% (t=2.5) হারে যাকাত দেয়ার বিধান রয়েছে।

২. আইন অবকাঠামো ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ

সর্বপ্রথম, ডিমিউচুয়ালাইজেশন। ডিমিউচুয়ালাইজেশনের ধারণাটি শুরু হয় বিংশ শতাব্দির শেষ ভাগে, ৯০ এর দশকে। ধারণাটি আসে exchange এর ব্যবসায় technological change এবং globalization এর থেকে। Electronic Communication Network (ECN) এর উদ্ভাবনের পর exchange গুলো geographical limitations কে উৎরে এক নতুন মাত্রা পায় যেখানে সদস্যদের প্রভাব মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কমে আসে। এই উত্তরণ বিনিয়োগকারীদের ব্যবসায়ের খরচ অনেক কমিয়ে আনে এবং তাদেরকে সুযোগ করে দেয় এলাকাভিত্তিক বাণিজ্য থেকে উৎরে একাধিক exchange এ বাণিজ্য করার। যদিওবা এই উন্নতি গুরুতরভাবে স্টক এক্সচেঞ্জের উপার্জন খর্ব করে যেমন: সদস্য ফি, লিস্টিং ফি হারায়। এর পরিপ্রেক্ষিতে স্টক এক্সচেঞ্জগুলো অন্য আয়ের উৎস খুঁজতে থাকে। অবশ্য সদস্যগণ এই আবিষ্কারকে অবজ্ঞা করতে চান তাঁদের মধ্যস্বত্ত ব্যবসায়ের চাহিদায় এবং ডিমিউচুয়ালাইজেশানের বাধা হয়ে দাড়ায়।

World Federation of Exchange (WFE) এর মতে ১৯৯৯ থেকে ২০০৩ সালে মিউচুয়াল এক্সচেঞ্জের হার ৪০% থেকে নেমে ২৫% এ দাঁড়ায়।

প্রযুক্তিগত উন্নতি, ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা স্টক এক্সচেঞ্জগুলোর সাংগঠনিক অবকাঠামো পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য করে।

সদস্য ও বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংশিষ্ট জটিলতা এবং ডিজিটাল যুগের কঠিন প্রতিযোগিতা স্টক এক্সচেঞ্জগুলোর উপর আস্থা ও গুরুত্ব কমাতে থাকে যার ফলশ্রুতিতে ডিমিউচুয়ালাইজেশানের ধারণাটি আসে।

Electronic Trading Systems এর আবিষ্কার স্টক এক্সচেঞ্জের নতুন সদস্যদের অন্তর্ভুক্তিকরণের খরচকে শুন্যের কোঠায় নিয়ে আসে, অথচ বাংলাদেশে স্টক এক্সচেঞ্জের সদস্য হতে নাকি শতকোটি টাকা লাগে। Mutual exchange এর ক্ষেত্রে বড় সমস্যাটি হল বর্তমান সদস্য বা মালিক (দুটি একই পক্ষ) দের স্বার্থের সাথে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থের জটিলতা, যা এক্সচেঞ্জের ব্যবস্থাপনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করে। যার সমাধান হল স্টক এক্সচেঞ্জ এর 'ব্যবস্থাপনা' এবং 'মালিকানা' আলাদা করা। তখন এক্সচেঞ্জের ব্যবস্থাপকরা বাণিজ্যের ওপর জোরদার মনোনিবেশ করতে পারে যা mutual structure এ সম্ভব নয়। তখন এস ই সি বা নিয়ন্ত্রকের দায়িত্ব আরও অনেকগুণ বেড়ে যাবে। বিনিয়োগকারীর স্বার্থ নিয়ন্ত্রণে আরও স্পষ্ট ও কঠোর আইন কানুন গড়ে দেবেন তবে তা জটিল কিছু নয়।

তথ্য বলে, demutualization এবং অতঃপর সম্ভাব্য listing যে কোন stock exchange এর operating performance এবং বাজারে এর মূল্যায়ন, উভয়ের ওপরই যথেষ্ট ভাল ঋনাত্মক প্রভাব ফেলে। কেননা তা সব শ্রেনীর বিনিয়োগকারীর আস্থা বাড়ায়। বাংলাদেশ সরকার ২০১২ এর মধ্যেই বাংলাদেশের স্টক এক্সচেঞ্জগুলোকে ডিমিউচুয়ালাইজড করার ঘোষণা দিলেও এর অগ্রগতি দেখে আমি সন্দেহ পোষণ করি এই প্রক্রিয়াটির অর্থপূর্ণ সমাপ্তি ঘটতে ২০১৪ সাল পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। তবে অবশ্যই ২০২১ সাল পর্যন্ত নয়।

দ্বিতীয়ত, স্টক-ব্রোকার অথবা ডিলারদের জন্য বাধ্যতামূলক licensing পরীক্ষার ব্যবস্থা রাখা দরকার। বিশ্বের বিভিন্ন স্টক এক্সচেঞ্জগুলোতেই এরকম পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। যেমনঃ আমেরিকার NYSE তে ব্রোকার / ডিলারদের রেজিষ্টার্ড রিপ্রেজেনটেটিভ হবার জন্য Series 7 পরীক্ষা দেয়া বাধ্যতামূলক। ভারতেও NCFM নামের পরীক্ষা দিতে হয় ডিলারদের। এছাড়াও প্রতিটি বিশেষায়িত ক্ষেত্রে কাজ করার জন্যই আলাদা আলাদা পরীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচিত হতে হয়। যেমনঃ কমোডিটি এক্সচেঞ্জ-এ কমোডিটি ফিউচারস ও অপশন ব্রোকারদের জন্য Series 3 পরীক্ষা বাধ্যতামূলক। এ পদ্ধতিটি আমাদের এ অপরিপক্ক মার্কেট এর উত্তরণের জন্য বিশেষভাবে দরকার। কারণ একটি উন্নত ও পরিপক্ক মার্কেট এর জন্য দরকার অর্থনীতি, সামাজিক নিয়ম-কানুন, ব্যবসা, হিসাব ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষায়িত জ্ঞান, যা কেবলমাত্র Buy/Sell করতে পারার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়।

তৃতীয়ত, বিভিন্ন Collective Investment Schemes, যেমনঃ Investment Trust, Unit Trust, ETF, ইত্যাদির জন্য যথাযথ নীতিমালা তৈরী করা। বিনিয়োগকারীদের জন্য Collective Investment Scheme একটি উপযুক্ত বিনিয়োগের ক্ষেত্র কারণ এটি ইক্যুইটির সাথে সাথে অন্যান্য মার্কেট-এ বিনিয়োগের মাধ্যমে diversified portfolio-এর সুবিধাও দিয়ে থাকে।

চতুর্থত, মিউচুয়াল ফান্ড একটি মার্কেট এর ভারসাম্য রক্ষায় অনেকটাই সাহায্য করে থাকে। এটি ক্ষুদ্র ও প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের জন্য ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের বড় একটি মাধ্যম। তাই বিভিন্ন ধরনের

মিউচুয়াল ফান্ডগুলোকে বিভিন্ন সুবিধা প্রদান (যেমন, tax benefit) এর মাধ্যমে আরও জনপ্রিয় করে তোলা দরকার। পুঁজিবাজারে লিস্টেড কোম্পানিগুলো বৃদ্ধির সাথে সাথে মিউচুয়াল ফাণ্ডের প্রকারেও বৈচিত্র আনা সম্ভব, যেমন: ব্যালেন্সড ফান্ড, সেক্টোরাল ফান্ড, ইনডেক্স ফান্ড, গ্রোথ ফান্ড ইত্যাদি বিনিয়োগকারীদের প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন সুবিধা প্রদান করতে সক্ষম।

পঞ্চমত, হাইকোর্টে আলাদাভাবে নতুন জুডিশিয়ারী বেঞ্চ করা দরকার, যাতে পুঁজিবাজার সংক্রান্ত যে কোন সমস্যা অতি দ্রুত সমাধান করা যায়।

ষষ্ঠত, একটি আন্তর্জাতিক মানের ইনডেক্স এর কথা আমরা অনেক দিন ধরেই শুনে আসছি। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য এ নতুন ইনডেক্সটি এখনো পর্যন্ত আমরা দেখতে পেলাম না। আশা করছি খুব শীঘ্রই একটা আন্তর্জাতিক মানের ইনডেক্স আমরা দেখতে পাবো যা S&P অথবা Dow Jones এর স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী হবে।

সপ্তমত, ইসলামিক পুঁজিবাজার, এ ধারণাটি যেহেতু আমাদের জন্য অনেকটাই নতুন একটি ক্ষেত্র, এর উন্নয়নের জন্য দরকার স্বয়ংসম্পূর্ণ ও কার্যকর legal, regulatory এবং supervisory অবকাঠামো ও নীতিমালা। অন্যান্য দেশগুলি যারা ইতিমধ্যে অনেক ধাপ এগিয়ে গেছে শরীয়াভিত্তিক পুঁজিবাজার পরিচালনায়, তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে তথ্য বিনিময় অত্যন্ত জরুরী আমাদের জন্য। কেবল তথ্য বিনিময়ই নয় দেশগুলোর মধ্যে প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞ মতামত ও পারস্পরিক সহযোগিতাও কাম্য।

ইসলামিক পুঁজিবাজারের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে অনেক বিশেষজ্ঞেরই অভিমত, এ মার্কেট এর পরিচালনার জন্য দরকার বিশেষায়িত নীতিমালা, উদাহরণস্বরূপ, বাহরাইনে ইসলামিক পুঁজিবাজারে তাদের debt securities গুলি ইস্যু, অফার ও লিস্টিং এর জন্য আছে ভিন্ন নীতিমালা ও দিক নির্দেশনা। একইভাবে, মালয়েশিয়াতেও private debt securities এর guideline এর মধ্যে রয়েছে ইসলামিক bond পরিচালনার জন্য সুস্পষ্ট নীতিমালা।

সবচেয়ে বড় বিষয়, এ marketগুলিতে শরীয়াভিত্তিক পণ্যের উৎপত্তি, উদ্ভাবন ও প্রসারের জন্য বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণ সংস্থার রয়েছে বিশেষ বিভাগ। যেমন মালয়েশিয়া সিকিউরিটিজ কমিশন এর রয়েছে আলাদা ইসলামিক ক্যাপিটাল মার্কেট বিভাগ। এ বিভাগগুলো অন্যান্য প্রশাসনিক বিভাগগুলোর সাথে মিলিতভাবে ইসলামিক পুঁজিবাজার এর জন্য নিয়ন্ত্রণ ও লালনপালনের আইনগুলি যেমন- licensing supervision, inspection, investigation এবং enforcement এর কাজগুলো করে থাকে।

আমাদের ইপ্সিত লক্ষ্যে পুঁজিবাজারকে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে সমস্ত পদক্ষেপ দরকার সেগুলো আমাদের এস ই সি ইতিমধ্যে প্রায় সবগুলোই গ্রহণ করেছেন। দরকারী পদক্ষেপ হিসেবে আমি স্পষ্ট করে পাঁচটি বিষয় উল্লেখ করব। এর একটি বাদ দিলেও আমরা এগুতে পারব না :

১. দ্রুত ডিমিউচুয়ালাইজেশন
২. বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণ
৩. সারভাইলেন্স বা নজরদারী
৪. বিশেষায়িত আদালত
৫. শক্তিশালী এস ই সি

পরিশেষে বলব, আমাদের পুঁজিবাজার ২০২১ বা তার আগেই হবে একটি সুগঠিত, ভারসাম্যপুর্ণ, আস্থার প্রতীক একটি বাজার যা আমাদের অর্থনীতিকে করবে ক্রমাগত উন্নত, স্থিতিশীল ও সুসংহত।